‘একুশে ফেব্রুয়ারি’ বিবেচনার পঞ্চাশ বছর

চিত্ত মণ্ডল

‘একুশে ফেব্রুয়ারি’, কিংবা ‘একুশে’ শব্দবন্ধ বা শব্দ উচ্চারিত হলে চেতনায় ‘মাতৃভাষার অধিকার’ এবং ভাষাভিত্তিক বাঙালি-জাতিসত্তার মনোবাসনা ‘বাংলাদেশ’ নামক একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রের অস্তিত্ব প্রতীকী হয়ে ওঠে। বাংলাদেশের বাংলা-সংস্কৃতি, মাতৃভাষার সংগ্রাম স্বাধিকার ও গণতান্ত্রিক আন্দোলন এখন বাঙালি-জাতীয়তাবাদের গন্ডি ছড়িয়ে আন্তর্জাতিক মান ও মর্যাদায় আসীন হয়েছে। এটা একটা দেশ ও জাতির পক্ষে গৌরবের পরাকাষ্ঠা বহন করে। ১৯৫২ সালের পূর্বতন পূর্ব পাকিস্তানের ভাষা আন্দোলন এখন বিশ্ববাসীর ‘আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস’ হিসেবে স্বীকৃত ও চিহ্নিত হওয়ার ফলে বৃহৎ ভাষাভাষি জাতি ও ক্ষুদ্র বিপন্ন ভাষাগোষ্ঠীর স্বাধিকার ও অস্তিত্বের প্রশ্নটা বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। বিপন্ন ভাষার সংরক্ষণ, ভাষার ওপর ঘরে-বাইরের আক্রমণ এবং ভাষা ও কোনো জাতিকে সংস্কৃতিহীন ক্রীতদাসে পরিণত করার অপকৌশল এখন পরাহত। বাংলাদেশের ‘একুশ’কে কেন্দ্র করে যেমন গোটা বিশ্বজুড়ে ভাষাপ্রীতি ও জাতিসত্তার ঘুরে দাঁড়াবার প্রত্যয় জন্ম নিয়েছে, তেমনি নিজ নিজ ভাষা ও সংস্কৃতি নিয়ে চর্চার ধারা এখন ক্রমশ বেগবান হচ্ছে। ভাষা ও সংস্কৃতি না থাকলে কোনো জাতির অস্তিত্ব থাকে না। সেই মানবগোষ্ঠী ক্রীতদাসে পরিণত হয়, এই বোধ এখন জনমানসে ক্রমশ বদ্ধমূল হচ্ছে। এই বোধি থেকেই ‘একুশে’ বা ‘আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস’—কে কেন্দ্র করে পশ্চিমবঙ্গ, বিশেষত কলকাতাকেন্দ্রিক সাহিত্যিকদের ভাষাসংক্রান্ত চর্চার দিগন্তও প্রসারিত হয়েছে। তবে একথা স্বীকার করতেই হবে যে, বাংলাদেশের রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন ভাষাগোষ্ঠীর মধ্যে স্ব স্ব জাতিসত্তার মাতৃভাষাকে রাষ্ট্রীয় মর্যাদার দাবিকে আরো সমুন্নত করেছে। তবে ‘একুশে’র বিষয়ে কলকাতার সাহিত্যিকদের রচনার ধারা তেমন বেগবান না হলেও পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা এবং আসামের বাঙালিদের মধ্যে মাতৃভাষার অধিকারের চেতনাকে সুদৃঢ় করেছে। মূল আলোচনায় প্রবেশের পূর্বে বিশ্বের এবং ভারতের বাঙালিদের একটি পরিসংখ্যান তুলে ধরা যাক। এই পৃথিবীতে মাতৃভাষা যাঁদের বাংলা, তাঁদের সংখ্যা ৩০ কোটির ওপরে। সারা বিশ্বের মোট জন সংখ্যার প্রতি ১০০ জনের মধ্যে ৪ জনের মাতৃভাষা বাংলা। জনসংখ্যার বিচারে বাংলাভাষী মানুষের সংখ্যানুসারে রাষ্ট্রসংঘের সরকারী ভাষায় কাজকর্ম করার প্রেক্ষিতে বাংলা ভাষার স্থান পঞ্চম। বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গ ছাড়া ভারতের অন্যান্য রাজ্যে বাঙালি সংখ্যা একরকম : অসমে ৪৯ লক্ষ; বিহারে ও ঝাড়খন্ডে ২৫ লক্ষ, মধ্যপ্রদেশে ২ লক্ষ, ওড়িশায় ৪ লক্ষ, ত্রিপুরায় ১৯ লক্ষ, আন্দামান-নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে ৭০ হাজার, মেঘালয়ে দেড় লক্ষ এবং দিল্লীতে ২৩ হাজার। এই পরিসংখ্যানের বিবেচনায় ভারতের বঙ্গভাষাভাষি মানুষের মধ্যে ‘একুশ’ কে নিয়ে উন্মাদনা ও চর্চা অব্যাহত আছে। একথা ঠিক যে, ১৯৫২ সালে যখন তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে (বর্তমানে বাংলাদেশ) রক্তাক্ত ভাষা-আন্দোলনের মধ্য দিয়ে বাঙালি-জাতীয়তাবাদ, স্বাধিকার ও স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্মের অঙ্কুরোদগমন হয় বাংলাদেশে, তখন ভারতের বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন সংবাদপত্রে ও সাময়িকীতে সংবাদ

পরিবেশন, সম্পাদকীয় এবং নিবন্ধ রচিত হতে শুরু করে। শুধু তাই নয়, একুশের চেতনা তখন স্বল্প সংখ্যায় হলেও সঞ্চারিত পশ্চিমবঙ্গের বঙ্গভাষী বিশিষ্ট লেখকদের মধ্যেও। তবে একথা ঠিক যে, বাংলাদেশের ভাষা আন্দোলনের সংবাদ গোড়া থেকেই এদেশের সংবাদপত্র, বিশেষত 'আনন্দবাজার পত্রিকা', 'দি স্টেটসম্যান' 'অমৃতবাজার পত্রিকা', 'হিন্দুস্তান স্ট্যানডার্ড' 'মতামত' ইত্যাদিতে ফলাও করে প্রকাশিত হওয়ার ফলে সমকালীন বুদ্ধিজীবীমহলের তা সৃষ্টি আকর্ষণ করে। এবং একারণেই প্রবন্ধ, নিবন্ধ, চিঠিপত্র ও কবিতা রচনা করে তাঁদের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন। প্রতিক্রিয়াজাত এইসব রচনার তাৎক্ষণিক উপযোগিতাকে অস্বীকার করা যাবে না।

২

'সংবাদমূলত কাব্য'

পাঁচের দশকের গোড়ায় সংঘটিত পূর্ব বাংলার ভাষা-আন্দোলন বা 'একুশের' আন্দোলনের সংবাদ পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে, একথা গোড়াতেই বলেছি। তবে একথা ঠিক যে, বাংলাদেশের একুশের ভাষা-আন্দোলনের সূত্রপাত যে, দেশভাগের পরের বছরেই হয়েছিল, তা এখন প্রমাণিত এবং কলকাতার 'স্বাধীনতা' এবং 'আনন্দবাজার পত্রিকার' বিভিন্ন সংবাদভাষ্য পাঠ করলেই তা অনুধাবন করা যায়। ১৯৪৮ সালের ভাষা-সংক্রান্ত বিতর্কও তৎকালীন সংবাদপত্রের দৃষ্টি এড়াতে পারেনি। তবে ১৯৫২ সালের ভাষা-আন্দোলনকে ভারতীয় সংবাদপত্র বিশেষ গুরুত্ব সহকারে পরিবেশন করে। দেখা যায় ১৯৫২ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি আনন্দবাজার পত্রিকায় 'ভাষা দমনে গুলী' শীর্ষক সম্পাদকীয়কে বলা হয়েছে : 'ইহা বস্তুত সাধারণ জনমতের উপর এবং জনসাধারণের এক স্বাভাবিক সাংস্কৃতিক দাবীর উপর গুলিবর্ষণ। ইহা ন্যূনতম গণতন্ত্রের নীতি ও আদর্শকে হত্যা করিবার প্রয়াস।' ২৪ তারিখে প্রকাশিত 'মাতৃভাষার জন্য' শীর্ষক সম্পাদকীয়তে বাংলাভাষীদের 'একুশে'-এর আন্দোলনকে স্বাগত জানিয়ে লেখা হয় 'পুর্ববঙ্গের জনসাধারণ ও পরিষদের সদস্যগণের বাঙলা ভাষার এই দাবী এতই যুক্তিপূর্ণ এবং সত্য ও সঙ্গত যে, আজ না হউক, কাল তাহা করাচীর কর্তৃপক্ষকে স্বীকার করিতেই হইবে।" আজ হইাই বলিবার ও হৃদয়ঙ্গম করিবার যে, ঢাকার ছাত্রগণের মাতৃভাষার প্রতি মর্যাদাবোধ এবং তাঁহাদের আদর্শনিষ্ঠাই পূর্ব্ববঙ্গের সাড়ে চার কোটি নরনারীর মাতৃভাষাকে অমর্যাদা ও উপেক্ষার হাত হইতে রক্ষা করিবার প্রাথমিক প্রয়াস প্রযুক্ত হইয়াছে।' পরে ২৬ ফেব্রুয়ারির' 'দুর্বুদ্ধি', ৮ মার্চ-এর 'মুস্কিল আসান-'এ' রাষ্ট্রভাষা বাঙলার সপক্ষে সম্পাদকীয়কে বিস্তারিত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টির মুখপাত্র 'মতামত'-এর ১৯৫২ সালের ১ মার্চ (৩য় বর্ষ ৯ম সংখ্যা) অনিমেষ রায় 'মাতৃভাষার জন্য পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালীর বীরত্বপূর্ণ লড়াই' শিরোনামে একটি নিবন্ধ প্রকাশ করেন। ঐ নিবন্ধে বস্তুবাদী দৃষ্টিকোন থেকে বিচার বিশ্লেষণ করে বলা হয় ঃ 'বাঙালীর মাতৃভাষাকে রক্ষা করার জন্য বাঙালীর আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার প্রতিষ্ঠা করার জন্য পূর্ব বাংলার বাঙালীর লড়াই, হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে দুই বাংলার স্বাধীনতার লড়াই, সাম্রাজ্যবাদের ও সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে জনগণের মুক্তির লড়াই; বিশ্ব মানবের শান্তি, গণতন্ত্র ও স্বাধীনতার লড়াই।' প্রগতিমনস্ক 'পরিচয়' এবং 'নতুন সাহিত্য' সাময়িকীতে 'একুশে'র সংগ্রামকে মহিমান্বিত করে সংবাদভাষ্য ও নিবন্ধ প্রকাশ করা হয়। 'পরিচয়' পত্রিকার সম্পাদক এবং বিশিষ্ট কবি

সুভাষ মুখেপাথ্যায় ফাল্গুন ১৩৫৮ সালের সংখ্যায় সম্পাদকীয়তে পূর্ব-বাংলার ভাষা আন্দোলন ও তাঁদের আত্মত্যাগের প্রতি সহমর্মিতা প্রকাশ করে লেখেন : 'মাতৃভাষার দাবি মুখে নিয়ে পূর্ব বাংলার যে অজ্ঞাতনাম অগণিত শহীদ খন্ডিত বিক্ষিপ্ত বাঙালী জাতির হাতে রক্তের রাখী বেঁধে দিল, তাদের স্মৃতিস্তম্ভ গুঁড়ো গুঁড়ো করে মাটিতে মিশিয়ে দিলেও বাঙালীর স্মৃতি থেকে কেউ সেই মৃত্যুঞ্জয়ী বীরদের মুছে দিতে পারবে না।' 'পরিচয়ের' ১৯৬০ সালের ভাদ্র সংখ্যায় বিশিষ্ট চিন্তাবিদ ও লেখক গোপাল হালদারের বাঙলা ভাষা-সমস্যা' প্রবন্ধেও 'একুশের' সংগ্রামকে ভাষার জন্য লড়াইয়ের আদর্শ হিসেবে তুলে ধরেছেন। 'দেশ' পত্রিকায় একুশের আন্দোলনকে গোড়া থেকেই সমর্থন জাগানো হয়। ১৯৫২ সালের ১ মার্চ সংখ্যার সম্পাদকীয় 'তরুণের রক্তদান'-এ লেখা হয় : 'প্রকৃতভাবে মানবতারই এই দাবী। মানুষের মৌলিক অধিকার যে স্বাধীনতা, সেই স্বাধীনতারই এ দাবী। বস্তুত জাতির বিশিষ্ট সংস্কৃতি এবং সভ্যতাই যদি বিনষ্ট হয়, তবে তাহার স্বাধীনতার কোন মূল্যই থাকে না।' 'ভাষা-আন্দোলন যে মূলত সংস্কৃতিক আন্দোলন, 'দেশ' সে-কথাটিই স্মরণ করিয়ে দেয়। এরপরেও ২২ মার্চ 'পূর্ব্ববঙ্গ ফ্যাসিস্ট নীতি' এবং ৫ এপ্রিল ও ২৬ এপ্রিল প্রকাশিত সম্পাদকীয়তেও 'একুশের' সমর্থনে ব্যাখ্যা রাখা হয়।

১৯৫২ সালের ২৯ মার্চ 'একুশে'-এর প্রায় একমাস পরে 'দেশ' পত্রিকায় বাংলার বিশিষ্ট কবি জীবনানন্দ দাশ-এর 'বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ভবিষ্যৎ' নামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়ন্ট ঐ প্রবন্ধে তিনি প্রাসঙ্গিক লেখেন : 'সংবাদ পড়ে মনে হয় খুব সম্ভব বেশি সংখ্যক পাকিস্তানিই বাংলাকে পূর্ব পাকিস্তানের একটি রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্থিত দেখতে চান। এঁদের ইচ্ছা ও চেষ্টা সফল হলে পশ্চিমবাংলার ভাষা ও সাহিত্যের পক্ষেও খুব বড় লাভ।' এই সময় ১২ এপ্রিল অমলেন্দু মুখোপাধ্যায় 'দেশ'-এ লেখেন 'ভাঙা বাংলার সাহিত্য'। তিনি নিজস্ব মতামত ব্যক্ত করে ঐ প্রবন্ধে দুই বাংলার সাহিত্যিকে মিলনমন্ত্রের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হওয়ার কথা বলেন। এই পর্যায়ে 'দেশ' পত্রিকার শেষ প্রবন্ধ অন্নদাশংকর রায়ের 'নতুন অধ্যায়'। লেখাটি ঢাকার 'দ্যুতি' পত্রিকা থেকে প্রাপ্ত বলে জানানো হয়। তিনি রাজনীতি ও জনমানসের বিবেচনার কথা মাথায় রেখে ভাষা-সমস্যার বিশ্লেষণ করেছেন ঐ প্রবন্ধে। তিনি তখন বাংলাভাষার সপক্ষে বলেন : 'দিন বদলাচ্ছে, মন বদলাচ্ছে—এমন দিন নিকট যেদিন তিনি দেখবেন— 'কোরান পড়া হয় বাঙলায়।' সমকালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পত্রিকা (১৯৫২-১৯৫৩) 'একতা'য় সমকালীন পূর্ব বাংলার ভাষা-আন্দোলন বিষয়ে দুটি লেখা প্রকাশিত হয়। একটি ছিল সংস্কৃতি বিষয়ক প্রতিবেদন এবং দ্বিতীয়টি ছিল ঢাকা থেকে এপারে আসা স্মৃতির আখরে লেখা কোনো এক সহপাঠীর রচনা। প্রতিবেদনে লেখা হয় : 'পূর্ব-বাংলার শহীদদের এই আত্মদান যেন ব্যর্থ না হয়। পূর্ব-বাংলার ভাষা বাঙলা আমাদেরও মাতৃভাষা। আমাদের ভাষাকে আমরা বাঁচাব।' বাংলাদেশের 'একুশে'র আন্দোলন এপারের বাংলাভাষী তরুণ সমাজকেও কীভাবে আলোড়িত ও অঙ্গীকারবদ্ধ করেছে, এই প্রতিবেদন সেই ইতিহাসই তুলে ধরেছে।

বলো কোন্ ভাষার কথা বলবে —

১৯৫২ সলের 'একুশে'র প্রতিক্রিয়া পড়েছিল তৎকালীন প্রগতিমনস্ক কবি সিদ্ধেশ্বর

সেন-এর কবিতায়। 'পরিচয়' (আগস্ট সেপ্টেম্বর, ১৯৫২/১৩৫৯, বঙ্গাব্দ, ভাদ্র-আশ্বিন)-এ 'কোন্ ভাষায় কথা বলবে' শিরোনামে প্রকাশিত হয় :

জীবন ভঙ্গুর ছড়িয়ে পড়ে চতুর্দিকে
ধুলোয় কাঁকরে হাসি কান্না মুখ লুকোয়
দিনরাত্রি একই বৃত্তে ফুঁপিয়ে কাঁদে
....
আমার অস্তিত্ব তোমার অস্তিত্বে বাঁধা
আমার শিকড় তোমার মাটিকে খোঁজে
আমার দিন চায় তোমার রাতির সাড়া
বলো কোন্ ভাষায় কথা বলবে?

কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের ১৯৫৩ সালে রচিত কবিতা 'পারাপার' মূলত ১৯৫২ সালেরই [illegible]জাত।' তিনি লেখেন :

আমরা যেন বাংলাদেশের
চোখের দুটি তারা
মাঝখানে নাকি উঁচিয়ে আছে—
থাকুক গে পাহারা।
দুয়ারে খিল
টানে দিয়ে তাই
খুলে দিলাম জানালা
ওপারে যে বাংলাদেশ
এপারেও সেই বাংলা।

[illegible]জিত রাষ্ট্রব্যবস্থা, কিন্তু ভাষার বন্ধনে এক বৃন্তের কুসুম বাঙালি-জাতিসত্তা। [illegible] 'বাংলাই' তার হৃদয়, ধর্ম তাকে বিভাজন করতে পারেনি। কবির অন্তরে [illegible] মন্ত্রের তরঙ্গধ্বনি বাংলাভাষা, তথা 'একুশে'র অনিবার্ণ শিখা।

[illegible] 'একুশে' : মিনি-সাহিত্য —

[illegible] আসামের ভাষা-আন্দোলন ও বিহারের বাংলা-হিন্দী ভাষা-পরিস্থিতি নিয়ে [illegible] চললেও পূর্ববঙ্গের ভাষা-আন্দোলন বা একুশে-এর ওপর ভিত্তি করে [illegible], বিশেষত ষাটের শেষপাদে অর্থাৎ বাংলাদেশের দুর্বার গণআন্দোলনের সময়ে '[illegible]' [illegible] নিয়ে কলকাতার সাহিত্যিকদের কলম থেকে তেমন একটা রচনা লেখা [illegible]। [illegible] ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের পূর্বে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ঢেউ-এ যখন [illegible] জনগণ অস্ত্র নিয়ে সমরাঙ্গনে ধাবমান, তখন পশ্চিমবঙ্গ থেকে প্রকাশিত [illegible] 'অনুত্তম' ফেব্রুয়ারি, ১৯৭০), 'কণ্ঠস্বর' (একুশে ফেব্রুয়ারি স্মরণ সংখ্যা), '[illegible]' ([illegible], ১৯৭০) এবং 'এখন' (ফেব্রুয়ারি, ১৯৭০) বিশেষ 'একুশে' সংখ্যা প্রকাশ [illegible]। [illegible] চট্টোপাধ্যায় এবং আশীষতরু মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত 'পৃথিবীর প্রথম মিনি [illegible]'[illegible] মার্চ ৭০ সংখ্যায় সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতা 'একুশে' এবং নারায়ণ [illegible] 'একুশে ফেব্রুয়ারি' পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের [illegible] এরকম ঃ

[illegible] জিনিস তালাবন্ধ—
[illegible]
[illegible] করে খুঁজছি।

ছোট মেয়েটা হঠাৎ
আমার মুঠোটা খুলে দিয়ে বলল,
এই তো!
এতক্ষণ তো তোমার হাতের মধ্যেই ছিল!

মুক্তির চাবি 'একুশে'। গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মধ্য দিয়ে রক্তাক্ত যুদ্ধ এবং তার পরিণতি স্বাধীন বাংলাদেশ। 'একুশে' ফেব্রুয়ারি সেই চাবি, যা আমাদের হাতের মধ্যেই ছিল, শুধু খোলার অপেক্ষায় বাক্সবন্দী। এই সংখ্যার অনন্য গল্প 'একুশে ফেব্রুয়ারী', যা সেলুলয়েডের চিত্রনাট্যের মতো সংহত এবং স্বল্পবাক :

'চৌধুরী সাহেবের বাড়ীর ছেলেদের মতো সে ইংরেজি শিখবে। ছেলেবেলায় এই স্বপ্ন দেখত সে। আর স্বপ্নটা এলেই হারিয়ে যেত সামনের মাঠ, আকাশ গাছপালা, পাখির ডাক, হাওয়ায় মৌরি ফুলের গন্ধ, নদীতে জেলেডিঙ্গিগুলো।

সে ইংরেজি পড়ার স্বপ্ন দেখত। আর সেই ফাঁকে কখন তার গোরুগুলো বেড়া ভেঙ্গে ঢুকে পড়ত প্রতিবেশীর বাগিচায়। মার-মার করে লাঠি হাতে তেড়ে আসত তারা। গরিব ক্ষেত-মজুরের ছেলে।

মা বলত, ইংরেজি তোকে কে শেখাবে বাবা? মক্তবের মাইনে দিতে পারিনি—মৌলবী সাহেব তোকে পড়াতে চায় না। কী করে বড় ইস্কুলে পাঠিয়ে তোকে ইংরেজি পড়াব?

সে ভাবত, পালিয়ে যাবে। মা বুঝতে পারত।

'ইংরিজি শিখে তোর আম্মাকে ভুলে যাবি। দেশ-গাঁকে ভুলে যাবি। চৌধুরী সাহেবের বড় ছেলে কলকাতা শহরে গিয়ে—'

মা-কে জড়িয়ে ধরে সে বলত : 'না-না কখনো ভুলব না— কোনো দিন না।' সে পালিয়ে গেল তারপর।

কিন্তু ইংরিজি শেখা হল না—কিছুই না। মন্বন্তর এল। ঘূর্ণি। কোথায় বাপ-কোথায় মা-কোথায় ভিটে! বিস্তর মানুষের হাড় জমে ছিল এখানে-ওখানে, কে কাকে গোর দেয় তখন? বাপ-মার হাড় সে চিনতে পারেনি। সেই পাঁজার ভেতরে। সে ইংরেজি শিখল না। শহরের হোস্টেলে গোস্ত রাঁধতে লাগল।

আরো কত বছর কেটে গেল।

তারপর শহরে নামল সৈন্য। উঠতে লাগল গুলির আওয়াজ। রক্তে ভেসে যেতে লাগল মাটী।

বুকের ভেতর যন্ত্রণা ঝকঝক করে উঠলো। কতকাল পরে। মন্বন্তরের হাড়ের পাঁজা থেকে তার আম্মার হাড় সে চিনে নিতে পারেনি। আজ শুনল মা-র কান্না : 'ইংরেজি শিখে তুই আমাকে ভুলে যাবি?"

ইংরিজি নয়। আর এক শত্রু। কিন্তু কি তফাৎ।

ছুটে বেরিয়ে এল রাস্তায়। রাইফেলের মুখোমুখি। চিৎকার করে বলল : 'ভুলব না—আমার আম্মাকে কোনোদিন ভুলব না।

গুলির শব্দ উঠল। ধান খেত। আকাশ। নদী। পাখি। মৌরিফুলের গন্ধ। একুশে ফেব্রুয়ারী শুধু পূর্ব বাংলা নয়, সারা বাংলা দেশ মা হয়ে তাকে বুকে টেনে নিল।'

অন্যন্যসাধারণ এই মিনি-গল্পটি বিশ্ব-সাহিত্যের গল্প-সম্ভারে জায়গা পাওয়ার যোগ্য।

নন্দদুলাল ভট্টাচার্যের 'এখন' বাংলার প্রগতিশীল মিনি-পত্রিকা। এর ফেব্রুয়ারির

১৯৭০ সংখ্যায় (১ম বর্ষ, দ্বিতীয় সংকলন) মুকুট সেনগুপ্ত-এর 'শপথ' এবং নন্দদুলাল ভট্টাচার্যের 'ঝড় উঠবে বলে', 'একুশে'-র এবং শহীদদের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। সত্যরঞ্জন বিশ্বাসের যিনি কুইন 'কণ্ঠস্বর'-এর 'একুশে ফেব্রুয়ারি স্মরণ সংখ্যা' দুই বাংলার কবিদের কবিতা বিন্যস্ত। এই সংখ্যায় প্রকাশিত অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত-এর 'পূব পশ্চিম' দুই বাংলার মানুষ, ভাষা ও সংস্কৃতির অভিন্ন জ্যা-যোজনার কথা স্মরণ করিয়ে দেয় : 'আমরা ভাষায় এক ভালোবাসায় এক মানবতায় এক,..../আমরাই একে অন্যের হৃদয়ে অনুবাদ....।' এই সংখ্যায় নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় 'একুশে ফেব্রুয়ারি স্মরণ' করতে গিয়ে লেখেন ঃ 'রাজনীতির বিধানে পরবাসী হয়েও সে বাংলা দেশ আমারও, আমিও তার উত্তরাধিকারের বাঙালী। একুশে ফেব্রুয়ারির এই ঐতিহাসিক লগ্নে দাঁড়িয়ে পূর্ব বাংলার মহিমাজ্জ্বল রূপের মধ্যে আমার সেই পূর্ব বাংলাকে আমি প্রণাম করি।' বিশিষ্ট কথা সাহিত্যিক ও গ্রন্থকার নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের এই নিবেদন তাঁর ফেলে আসা বাংলাদেশকে স্মরণে-বেদনায়-বিষন্নতায়-আত্মমগ্নতায় হৃদয়ে ধারণ করা। শশিধর রায় সম্পাদিত 'অনুত্তম'-এর একুশে ফেব্রুয়ারি সংখ্যাটি অনন্য। দুই বাংলার বিশিষ্ট কবিদের কবিতা সংকলিত হয়েছে এই সংখ্যায়। সম্পাদকীয়তে বলা হয়েছে : '২১শে ফেব্রুয়ারি। ১৯৫২ সাল। একটি উজ্জ্বল দিন। বাঙালির ঘরে ফেরার দিন।' সত্যি একুশে ফেব্রুয়ারি বাঙালি জাতির স্বদেশযাত্রা। এই সংখ্যায় প্রবন্ধ-নিবন্ধ, কবিতা এবং গল্পে 'একুশে' এবং বাংলাদেশের স্মৃতি একাকার হয়ে গেছে। অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুষ্ঠ পালের ছড়া', অর্দ্ধেন্দু কুমার নন্দীর 'রক্তে রাঙ্গা ২১ শে ফেব্রুয়ারী' এবং সুবীর রায়চৌধুরীর 'একুশে ফেব্রুয়ারির কলঙ্ক' মনোজ্ঞ। সুবীরবাবু তাঁর রচনায় পশ্চিমবঙ্গবাসীর মানসিকতাকে ধিক্কার জানিয়েছেন 'একুশে'র আত্মত্যাগের সঙ্গে প্রতিতুলনা করে।

১৯৭০ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারি 'সাপ্তাহিক বসুমতী' (সম্পাদক : জয়ন্তী সেন) তিনটি প্রবন্ধ এবং তিনটি কবিতা দিয়ে ২১শে ফেব্রুয়ারিকে স্মরণ করে। সম্পাদকীয়তে 'একুশের' তুলনা করে হিন্দীর আগ্রাসন এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ভাষানীতির সমালোচনা করে আলোকপাত করা হয়। অমিয়কুমার হাটির 'একুশে স্মরণে বক্ষে বাজে বাঁশী', অপর্ণা ভাদুড়ীর 'একুশে ফেব্রুয়ারী : স্মৃতি, ঐতিহ্য ও আজকের সংগ্রাম' এবং কমলকুমার মিত্রের 'একুশে ফেব্রুয়ারী প্রসঙ্গে' প্রবন্ধত্রয়ে 'একুশে'র চেতনা, প্রাসঙ্গিকতা, ঐতিহাসিক বিবর্তন এবং সমকালীন গণ-অভ্যুত্থানের সংলগ্নতার প্রেক্ষিতে পশ্চিমবঙ্গের ভাষা পরিস্থিতি নিয়ে ক্ষোভ ও বিষন্নতা প্রকাশ করা হয়েছে। বিশিষ্ট প্রগতিশীল কবি কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত-এর 'একুশে ফেব্রুয়ারী', উমাপদ নাথের 'একুশে ফেব্রুয়ারি' এবং অমিতা ভৌমিকের 'স্ববিরোধিতার উন্মত্ত প্রাচীর'—এ একুশে ফেব্রুয়ারির ভাষা-আন্দোলন এবং উনসত্তরের দুর্বার গণ-অভ্যুত্থানের সমীভবনের সন্ধান করা হয়েছে। তবে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে পরের বছর প্রচুর রচনা সৃষ্টি হলেও 'একুশে' ভিত্তিক তেমন কোনো রচনা চোখে পড়ে না। তবে যুদ্ধচলাকালে বদরুদ্দীন উমরের ভাষা-আন্দোলন সংক্রান্ত একটি রচনা বেশ আলোড়ন তুলেছিল। ১৯৭১ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি কলকাতার নবজাতক প্রকাশন থেকে বিশিষ্ট কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় 'একুশের রক্তে' প্রকাশিত হয়। দুর্ময় সংগ্রামের সময়ে রচনা সংগ্রহ করে, এপারের 'কম্পাস-সরণী' এবং 'রাঙামাটি' থেকে কিছু লেখা নিয়ে এই সংকলনটি তৈরি করা হয়। সাহিত্য এবং শিল্পবিচারে এসব রচনা তেমন মহার্ঘ না হলেও ইতিহাসের ধারায় তা

চিত্ত মন্ডলের 'একুশে ফেব্রুয়ারি : চীনের ৪ঠা মে আন্দোলন ও একটি রাজনৈতিক বিশ্লেষণ।' চীনের সাংস্কৃতিক বিপ্লবের ক্ষেত্রে ৪ঠা মে-এর আন্দোলন এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা-যুদ্ধের সূচক হিসেবে ২১ ফেব্রুয়ারিকে প্রতিতুলনা করে লেখক ভাষা-আন্দোলনকে মহিমান্বিত করেছেন। ১৯৯৫ সালে 'ঐক্যতান গবেষণাপত্র'-এর দুটি মাতৃভাষা চর্চা সংখ্যা প্রকাশিত হয়। এতে বিন্যস্ত রচনাগুলি দুই বাংলার চিন্তাবিদদের রচিত হলেও, তাতে 'একুশে'র পরিবর্তে সার্বিক মাতৃভাষার সংকট ও বাংলাভাষার সমস্যা নিয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। ১৯৯৬ সালে 'ক্রন্দশী সাহিত্যপত্র' থেকে প্রকাশিত হয় কবি কৃষ্ণ ধরের ভাষা-আন্দোলনের পটভূমিকায় রচিত দুটি কাব্যনাট্য 'জেগে আছো বর্ণমালা' এবং 'একুশে প্রতিদিন'। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে, পশ্চিমবঙ্গের বিশিষ্ট নাট্যকার মন্মথ রায় এর অনেক আগেই রচনা করেছিলো 'একুশে ফেব্রুয়ারি' নামের একটি নাটিকা। এইসব নাটকে মূলত ভাষা-আন্দোলনের গৌরবান্বিত অধ্যায়, আত্মত্যাগ এবং তার তাৎপর্যকে প্রেক্ষাপটে রেখে নাট্যবিন্যাস ও তার পরিণতিকে সংহত করা হয়েছে।

কলকাতাস্থ 'বাংলাদেশ উপ-হাইকমিশন' থেকে বহুদিন ধরেই একুশে ফেব্রুয়ারির স্মরণে স্মারক-পত্রিকা প্রকাশিত হয়ে থাকে। সেসব পত্রিকা শুধু বাংলাদেশের লেখকদের রচনায়ই সমৃদ্ধ হয়ে থাকতো। পশ্চিমবঙ্গ, তথা কলকাতার কোনো লেখক সেখানে লিখতেন না। বাংলা ভাষা, কিংবা একুশে ফেব্রুয়ারি নিয়ে কলকাতার মানুষজন, কিংবা লেখকেরা প্রাদেশিকতার ভয়ে তেমন একটা ভাবনা-চিন্তা করতেন না। তবে ১৯৯৮ সালের ২১ শে ফেব্রুয়ারি শহীদ দিবস উপলক্ষে 'অমর একুশে শ্রদ্ধাঞ্জলি' নামে যে স্মরণিকা প্রকাশিত হয় বাংলাদেশ দূতাবাস থেকে, তাতে বাংলাদেশের লেখকদের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ, বিশেষত রাজধানীর বহু লেখক একুশে ফেব্রুয়ারি নিয়ে প্রবন্ধ, নিবন্ধ, কবিতা ইত্যাদি নিয়ে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ রচনা লেখেন। অন্নদাশঙ্কর রায়ের 'আমি কি ভুলিতে পারি' নিবন্ধে একুশের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করে লিখলেন : 'দেখা গেল ধর্ম এক হলেও রাষ্ট্র দুই হতে পারে, রাষ্ট্রভাষাও দুই হতে পারে, জাতিও দুই হতে পারে। আরো দেখা গেল যে, বাংলাদেশের হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ খ্রিস্টান সবাই মিলে এক জাতি। এই সব কিছুরই মূলে একুশে ফেব্রুয়ারির মর্মান্তিক ঘটনা, যা অবিস্মরণী।' সাম্প্রদায়িক দ্বিজাতিতত্ত্বের অসারতাকে তিনি এইভাবেই যূপকাষ্ঠে ঝুলিয়ে দেন। বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী প্রফেসর হোসেনুর রহমানের 'বাংলাদেশ : স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যৎ' একুশের প্রেক্ষাপটে বাঙালি জাতিসত্তার কাহিনী। সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত-এর 'বাংলাদেশ : ২৯ এপ্রিল ১৯৯১', তারাপদ রায়ের 'জন্মভূমি' এবং দিব্যেন্দু পালিতের 'প্রত্যেক বুকেই আছে সেই দেশ' জন্মভূমির প্রতি, বাংলা ভাষার প্রতি নাড়ীর টানের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'আমাদের ভাষা, আমাদের সংস্কৃতি : বাংলাদেশে বাংলাভাষা ও রবীন্দ্রনাথ' শীর্ষক প্রবন্ধে 'একুশে'র প্রসঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের বাংলাভাষার দীর্ণদশা এবং হিন্দীর আক্রমণে বাংলা ভাষা ও বাঙালি জাতিসত্তার নাভীশ্বাস ওঠার কথা ব্যক্ত হয়েছে। ড. মানস মজুমদারের 'একুশে ফেব্রুয়ারির ভাবনা'য় ভাষা-আন্দোলনের আয়নায় পশ্চিমবঙ্গের বাংলা ভাষাকে ফিরে দেখার প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। ড. শীলা বসাক তাঁর 'একুশে ফেব্রুয়ারি : এক অনন্য ঐতিহ্য' প্রবন্ধে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের সূচক হিসেবে একুশে ফেব্রুয়ারির তাৎপর্য বিশ্লেষণ করেছেন। ড. প্রথমা রায়মন্ডলের

'বাংলাদেশের উপন্যাসে একুশে ফেব্রুয়ারির প্রভাব' শীর্ষক একাডেমিক রচনায় বাংলাদেশের উপন্যাসে একুশে ফেব্রুয়ারি কিভাবে প্রভাব ফেলেছে, তারই নিপুন বিবেচনা বিম্বিত হয়েছে। ড. চিত্ত মন্ডলের 'জহির রায়হানের একুশের গল্প' প্রবন্ধে জহির রায়হানের সাতটি একুশের গল্প নিয়ে চুলচেরা বিশ্লেষণ ধরা পড়েছে। ১৯৯৮ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি 'দেশ' পত্রিকা ভাষা-আন্দোলনের ওপর একটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করে। তাতে বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের লেখকদের রচনা বিন্যস্ত হয়। তবে বাংলাদেশের প্রবন্ধ ও কবিতায় একুশে ফেব্রুয়ারি নিয়ে ইতিহাসভিত্তিক আলোকপাত থাকলেও পশ্চিমবঙ্গের লেখকদের রচনায় পরিলক্ষিত হয়েছে নিজ নিজ মাতৃভাষাকে ফিরে দেখার প্রবণতা। সরাসরি 'একুশ' বিষয়ে না হলেও 'একুশ' এসব রচনার অনুষঙ্গ। সম্পাদক অমিতাভ চৌধুরী 'একুশে ফেব্রুয়ারি ও বছরের অন্যসময়' শিরোনামের সম্পাদকীয়তে পশ্চিমবঙ্গে ভাষা সম্পর্কিত দীনতার কথা ব্যক্ত করে কেনো পশ্চিমবঙ্গে একুশের অনুষ্ঠান তেমন হয় না, তার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে তিনি বলেছেন : 'শিলচরের গুলিচালনার দিনটি স্মরণে পশ্চিমবাংলায় কোনও অনুষ্ঠান হয় না, কারণ তাতে প্রাদেশিকতার গন্ধ এসে যাবে। কিন্তু একুশে ফেব্রুয়ারির শহিদ দিবসটি সম্পর্কে পশ্চিমবাংলার উৎসাহ ক্রমশ বাড়ছে। এই 'বাড়ার' পেছনে বাঙালি জনমানসের বুদ্ধিজীবীয় চেতনা অনেকাংশে কাজ করেছে। সেই বিচারে পশ্চিমবাংলায় 'বাংলার' অবস্থান শোচনীয়। অন্যদিকে পশ্চিমবঙ্গের লেখাগুলিতে 'দেশে'র এই বিশেষ সংখ্যায় 'মাতৃভাষা' নিয়ে নানারকম বিশ্লেষণ ও অর্ন্তদন্ড চলেছে। এই পর্যায়ের শিরোনাম : 'একুশে যার জন্মদিন'। প্রাসঙ্গিক বলা হয়েছে : 'মাতৃভযার প্রতি প্রেম অবিরত বলেই হয়তো, এর গদ্যরীতি যখনই অযত্নে ও অপপ্রয়োগে আক্রান্ত হয়, ব্যাকরণ শিথিল হতে দেখা যায়, তখনই এই ভাষার লেখক ও শিক্ষকেরা এবং আবেগাতিশয্য কি সাক্ষরতার অতর্কিত এবং ব্যাপক প্রসারের ফল? কিংবা বাংলা শিক্ষাব্যবস্থার দুর্বলতার জন্য? বাঙালির মননশীলতা অধোগামী হয়েছে বলেই কি গদ্যসাহিত্য ক্ষীণবল?' জ্যোতিভূষণ চাকীর 'ব্যাকরণ ধরাশায়ী, প্রয়োগ অযত্নলালিত, বিশ্লেষণের ভাবে ন্যুব্জ : বাংলা ভাষা যদি শক্তি হারায় আশ্চর্যের কিছু নাই', মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়ের 'মানুষের মুখের ভাষাই বিস্তৃত করে বাংলা ভাষার পরিধিকে : শৈশবে শিক্ষাসত্রেই বাংলাকে মজবুত ভিত্তি দিতে হবে', সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'এখনও দুদিকের প্রবাসী বাঙালিদের মধ্যে কোথায় যেন দূরত্ব আছে : প্রবাসে বাংলা ভাষা' এবং দীপঙ্কর চক্রবর্তীর 'আধুনিক দৃষ্টিকে নস্যাৎ করে দেয় যুক্তিহীন শুদ্ধতাবাদ : বাঙালিমানস থেকে বাংলা ভাষা কি খুব দূরে চলে যাচ্ছে?' ইত্যাদি শিরোনামের রচনাগুলো এসব প্রশ্ন তুলেছে এবং উত্তরের অন্তর্তদন্ড করেছে।

কবিতায় শক্তি চট্টোপাধ্যায় 'ভাষায় ভরা/বুকের মধ্যে চলছে ছুটে সোনালি হরকরা-'য় বিম্বিত হয়েছে মাতৃভাষা-প্রীতি ও ২১ ফেব্রুয়ারির আগুনের গল্প। কবিতাই লেখেন : 'বায়ান্নর ফেব্রুয়ারি জুড়ে বড় বেশি জ্বর ছিল; বন্ধ্যা ক্রোধে, ভীতিতে, কম্পনে বন্দি আমি, আমার ভায়ের তাজা রক্তধারা রাজপথ থেকে ছুটে এসে চৌকিটিকে নিমেষেই ভাসানে পাঠায় আর বিদ্যাসাগরের বর্ণপরিচয় আর রবীন্দ্ররচনাবলী শহিদের শোণিত ধারায় অবিরাম পুষ্পবৃষ্টি করে।' কবির বাকভঙ্গিতে মাতৃভাষার ঐতিহ্যাশ্রিত পদাবলী গান হয়ে দীপান্বিতা হয়ে ওঠে। বিভাস রায়চৌধুরীর 'শিমূলভাষা, পলাশভাষা'-র

'তিরন্দাজ', 'বর্ণমালা', 'ভাষা', 'প্রেরণা', 'রাখি', 'বিদ্রোহের কবিতা, প্রেমের কবিতা', এবং '৮ই ফাল্গুন' পর্বের দীর্ঘবলয়ে ভাষাপ্রীতি অনন্যতা পায়; ২১ ফেব্রুয়ারি বা ৮ই ফাল্গুন হয়ে ওঠে সংগ্রামের প্রতীক ঃ 'ফাল্গুনের আট তারিখ কবি-কবি গাছে/ যুগে যুগে লড়াইয়ের লগ্ন হয়ে আছে..../ লগ্ন বাঁচে চুতর্দিকে ধিকি ধিকি ধিকি/তিরধনুক আগলে আছে সবাই বাল্মীকি!' 'দেশ' পত্রিকাটি এ-রকম ভাবনাচিন্তা সাজিয়ে 'একুশে' বিষয়ে একটি সংখ্যা বের করে দায়বদ্ধতার পরিচয় দিতে পেরেছে।

১৯৯৮ সালের ২৬ শে মার্চ 'কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় মাতৃভাষা উদযাপন সমিতির' পক্ষ থেকে 'মাতৃভাষা' শীর্ষক স্মারক-পুস্তিকা প্রকাশিত হয়। এতে নিবন্ধ, প্রবন্ধ ছাড়া 'একুশে'-নির্ভর কয়েকটি কবিতাও রয়েছে। রথীন্দ্রনারায়ণ বসু 'মাতৃভাষা দিবস' : একটি দীর্ঘ অনুচ্ছেদ' নিবন্ধে 'একুশে'র তাৎপর্য বিশ্লেষণ করেছেন। ড. জ্যোতির্ময় ঘোষের 'আমি কোন্ জন, সে কোন্ জনা?', ধূর্জাটি প্রসাদ দে-এর 'একুশের চিন্তা', কিংবা বিমলকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'ফেব্রুয়ারি ২১', বাংলাভাষাকে কেন্দ্র করে স্মৃতিসত্তা চঞ্চল হওয়ার ইতিহাস-এর গন্ধ ছড়িয়ে দেয়। জগদ্বিন্দ্র মন্ডলের 'সেদিন', শ্যামল চক্রবর্তীর 'কোনদিকে তীর, কিংবা অত্রি ভৌমিকের 'মাতৃভাষাকে' শীর্ষক কবিতাত্রয়ে মাতৃভাষার প্রতি তীব্র মমতার এবং অন্তর্দহনের আলো বিচ্ছুরিত হয়েছে। ১৯৯৮ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষামন্ত্রকগুলি কর্তৃক প্রকাশিত 'শিক্ষাদর্পণ' পত্রিকার মার্চ সংখ্যায় ২১ শে ফেব্রুয়ারি স্মরণে ক্রোড়পত্র প্রকাশ করা হয়। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রাক্তণ শিক্ষামন্ত্রী এবং ২১শে ফেব্রুয়ারির আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী গোপাল গঞ্জের কান্তি বিশ্বাসের 'প্রসঙ্গ : ভাষা ও ভাষা আন্দোলন' এই ক্রোড়পত্রের বিশেষ রচনা। এই প্রবন্ধে তিনি বলেন ঃ 'জীবনযুদ্ধে, জীবিকার সন্ধানে ভাষার ভূমিকাকে অস্বীকার করার কোনো অবকাশ নেই। এখানেই জাতিসত্তার সঙ্গে ভাষার প্রশ্ন যুক্ত হয়ে আছে। কায়েমি স্বার্থের পক্ষ থেকে ভাষার উপর আক্রমণ আজ নতুন নয়। আয়ারল্যান্ডে, বেলজিয়ামে এই ভাষাকে কেন্দ্র করে অনেক রক্তক্ষরা সংগ্রাম হয়েছে।'

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস

১৯৯৯ সালের ১৭ নভেম্বর ইউনেস্কো কর্তৃক ২১ ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষিত হওয়ার ফলে 'একুশের' চোহারাটা আমূল বদলে যায়। পশ্চিমবঙ্গে ২১ ফেব্রুয়ারি আর ভিনদেশী তকমায় চিহ্নিত থাকে না। তার আন্তর্জাতিক অভিযাত্রা ও মান্যতা সূচিত হওয়ার ফলে সরকারী আর বেসরকারী উদ্যোগে নানা ধরনের অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ভাষা শহীদ স্মারক নির্মিত হয়। পশ্চিমবঙ্গের লেখকেরা 'একুশ'কে নিয়ে প্রবন্ধ, গল্প, নাটক, গান লিখতে থাকেন। বিশেষ এই ঐতিহাসিক দিনে দৈনিক সংবাদপত্রের বিশেষ 'একুশে' সংখ্যা প্রকাশিত হয়। লেখা হয় সম্পাদকীয়, উপ-সম্পাদকীয় ইত্যাদি। প্রকাশিত হয় 'একুশে' বিষয়ে নানা সংকলন, গ্রন্থ।

২০০০ সালের ২১ ফ্রেবুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদ্‌যাপনের প্রথম বর্ষে 'কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাতৃভাষা সমিতি' থেকে প্রকাশিত হয় 'মাতৃভাষা' নামক একটি পুস্তিকা। এতে মোট ১৪টি রচনা বিন্যস্ত হয়েছে। আশিযকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'মাতৃভাষা দিবস' নিবন্ধে 'বিশ্বমানবের সাংস্কৃতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক

উন্নয়ন'-র ক্ষেত্রে অবলম্বন হিসেবে মাতৃভাষাকে আশ্রয় করতে বলেছেন। সুরভি বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'মাতৃভাষার জন্য' নিবন্ধে 'মাতৃভাষা'র অধিকার ও তার সঙ্গে জাতিসত্তার অস্তিত্ব জড়িয়ে থাকার প্রশ্ন তুলেছেন। নীতীশ বিশ্বাস তাঁর একুশের ভাবনা' প্রবন্ধে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' 'সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্ত', 'ভারতে বাংলা ভাষা', 'সংস্কৃতির প্রশ্নে ভাষা' ইত্যাদি পর্যয়ের আলোচনার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষার তাৎপর্য এবং তারই প্রেক্ষিতে ভারতের ভাষা-পরিস্থিতি নিয়ে নানা কূটভাষা নির্মাণ করেছেন। পাঁচটি কবিতায় একুশে এবং ভাষাপ্রীতির ছায়া পড়েছে। পান্নালাল সরকার-এর 'জাগরণের দিন' এবং অত্রি ভৌমিকের 'ভাষার জন্য' কবিতাদ্বয়ে ভাষা ও ভাষার অধিকারের সঙ্গে যে বাঙালি জাতিসত্তার সম্প্রীতি ও মিলন জড়িত, সেই কথাটিই সোচ্চারে বলেছেন।

২১ ফেব্রুয়ারি 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে ঘোষিত হওয়ার পরে 'দৈনিক প্রতিদিন' এবং 'দৈনিক সত্যযুগ' দুটি ক্রোড়পত্র প্রকাশ করে। এতে কয়েকটি নতুন লেখা ছাড়াও কয়েকটি পুরনো লেখা সংকলন করা হয়। 'গণশক্তি'তে প্রকাশিত হয় অন্নদাশঙ্কর রায়ের 'অবিস্মরণীয় ১৯৫২' : এই রচনায় তিনি ১৯৫২ সালের ভাষা-আন্দোলন কিভাবে 'শোক দিবস' এবং 'আনন্দময় উৎসবে' পরিণত হয়, সে কথার স্মৃতিচারণা করেছেন। পশ্চিমবাংলার বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী এবং চিন্তাবিদ রাজনৈতিক -দার্শনিক হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় তাঁর 'একুশে ভাবনা' প্রবন্ধে ভাষা-আন্দোলনের তাৎপর্যের প্রেক্ষিতে পশ্চিমবঙ্গের ভাষা-পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘের সাধারণ সম্পাদক ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সেই দিন : বিশ্ব দিন'-এ ২১ শে ফেব্রুয়ারির আন্তর্জাতিকতায় পৌঁছনো এবং তার মহিমার প্রেক্ষাপট বর্ণিত হয়েছে।

রাম বসুর 'আমাদের জোড়া ভ্রু-র মাঝখানে' কবিতায় একুশকে স্বাধীনতার সঙ্গে প্রতিতুলনা করা হয়েছে : 'মুক্ত অক্ষরগুলো এক লোক থেকে অন্য বহু লোক গেঁথে গেঁথে/গড়ে তুলেছে পান্না প্রভ নিটোল শব্দ/স্বাধীনতা।' কবি কৃষ্ণ ধর তাঁর 'অনিদ্র একুশে' কবিতায় 'একুশকে ফেব্রুয়ারির' চেতনাকে বারে বারে ধাক্কা মেরে 'প্রহরীর' মতো প্রতীকে দেখেছেন : 'শিয়রে পাহারা দেয় লালকমল অনিদ্র একুশে।' অনির্বাণ দত্তের 'এই ঝড়ে' কবিতায় একুশের চেতনায় আচ্ছন্ন হয়ে বাঙালি জাতিসত্তার শিকড় সন্ধানে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। 'দৈনিক প্রতিদিন'-এর ক্রোড়পত্রে সাতটি প্রবন্ধ-নিবন্ধ, একটি গান এবং চারটি ভাষাবিষয়ক কবিতা (বাংলা ভাষা : অতুলপ্রসাদ সেন : আবার আসিব ফিরে : জীবনানন্দ দাশ; বঙ্গভাষা : মধুসূদন দত্ত এবং স্বদেশী ভাষা : রামনিধি গুপ্ত) সংকলিত হয়েছে। পবিত্র সরকারের 'মাতৃভাষা : তাহার আহ্বানগীত'-এ লেখক আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে বাঙালি জাতিকে 'একবার ঘরের দিকে ফেরার' ডাক দিয়েছেন। অরুণ সেন 'তুমিই আমার উনিশ-একুশ, জন্মের পরিচয়'-এ একুশে ফেব্রুয়ারি ও আসামের ১৯শের ভাষা-আন্দোলনের প্রতিতুলনা করে বাঙালিজাতির জন্মকথা বিবৃত করে ভাষাপ্রীতির আনুষ্ঠানিকতার যাত্রায় ব্যথিত হয়েছেন। বিজিতকুমার দত্ত তাঁর 'মাতৃভাষার পাশে দাঁড়িয়ে বাংলাদেশ' শীর্ষক রচনায় বলেছেন : 'মাতৃভাষাকে এড়িয়ে বিশ্বায়ন সম্ভব নয়। দেশকে ভালবাসলে মাতৃভাষার চর্চা আমাদের করতে হবে। বাঁচার জন্যই এই প্রতিজ্ঞা। আমাদের বড়ো লাভ মাতৃভাষার পাশে দাঁড়িয়ে আছে স্বাধীন বাংলাদেশ।' অশোক মুখোপাধ্যায়ের 'নিজেরাই কি ঠিক পথে চলছি?' কিংবা নীতীশ

বিশ্বাসের 'ভিন্ন তাৎপর্য' বা অমিতাভ দাশগুপ্তের 'নাস্তিকের পাপপুণ্য' বাঙালিকে নিজের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেয়। প্রতুল মুখোপাধ্যায়ের 'মায়ের ভাষার গান' আমাদের স্মৃতিকে উসকে দেয়।

এই বছরেরই ২১ ফেব্রুয়ারি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়গুলির সমন্বিত পত্রিকা 'শিক্ষা দর্পণ' (চতুর্থ সংখ্যা)-এ 'ভাষা ক্রোড়পত্র' প্রকাশিত হয়। এই সংখ্যায় এই পর্যায়ে ৬টি রচনা রয়েছে। এসব রচনায় ভাষাকে বিভিন্ন দিক থেকে দেখার চেষ্টা করা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী কান্তি বিশ্বাসের 'স্বাগত বিশ্ব মাতৃভাষা দিবস'-এ মানব সমাজের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছে এইভাবে : 'এই প্রথমে বিশ্বে মাতৃভাষা দিবস উদযাপনের অন্যতম শর্ত হোক—জীবনে বিভিন্ন স্তরে মাতৃভাষার তাৎপর্য সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করা, ভাষার শ্রীবৃদ্ধির জন্য সচেষ্ট হওয়া এবং নিজ মাতৃভাষার জন্য গৌরববোধ অনুভব করা। এই দিনটি বাংলাভাষীদের মনের অর্গল অনেকখানি খুলে দেবে, লেখক এই প্রত্যয় পোষন করে প্রবন্ধ শেষ করেছেন।

২০০১ সালের কলকাতা বইমেলায় কাজল চক্রবর্তীর সম্পাদনায় 'সাংস্কৃতিক খবর' থেকে প্রকাশিত হয় 'সাহসী বর্ণমালা' কবিতা-সংকলন। এই সংকলনে বাংলাদেশের একুশে ফেব্রুয়ারি ও আসামের উনিশে মে-র ভাষা-শহীদদের নিবেদিত আবৃত্তিযোগ্য কবিতা-সংকলিত হয়। এতে বাংলাদেশের কবিদের পাশাপাশি কলকাতার ৫২ জন কবির কবিতা বিন্যস্ত হয়েছে। বিশিষ্টজন থেকে সাধারণ কবিদের কবিতাও এতে স্থান পেয়েছে। মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়ের 'সমস্ত শব্দের উৎসে' মাতৃভাষার অযুত ডানা মেলা' ভালবাসার কথা বলা হয় : 'শহিদের রক্তে-শিকলিকাটা ডানা বর্ণমালা-আত্মস্ফুর্তি মুক্তির বলাকা।' সিদ্ধেশ্বর সেনের 'ভাষা-হৃদি দেশে' আসামের ভাষা আন্দোলন এবং বাংলাদেশের ভাষা-আন্দোলন একাকার হয়ে যায়। তরুণ সান্যালের 'তারা' কবিতায় ভাষা-আন্দোলনের গভীর তাৎপর্য ব্যঞ্জিত হয়। অমিতাভ দাশগুপ্ত-এর 'নিশিথফেরি' শোনায় বর্ণমালার ঐশ্বর্যময় ঐতিহ্যের গান, সেখানে ঢাকা ও বরাক উপত্যকা গভীর প্রত্যয়ে অঙ্গীকারবদ্ধ হয়। সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত-এর 'ভাষাদেশ' শোনায় জীবনের অন্বেষা : মৃত্যু যখন শেষ/ বাংলা ভাষাই তখন আমার একমাত্র দেশ।' ভাষাভিত্তিক অসাম্প্রদায়িক এই চেতনা ফল্গুধারার মতো বাঙালি জাতিসত্তায় প্রবাহিত হোক। আশিস সান্যালের "বাংলা ভাষা আমার ভাষা' ভাষা-আন্দোলনের শহীদদের নান্দীপাঠ শোনায়। মঞ্জুষ দাশগুপ্তের 'সমীপেষু' শোনায় মাতৃভাষার প্রতি ভালোবাসার নিবেদিত প্রাণের আকুতি। কাজল চক্রবর্তীর 'আমার মাতৃভাষা' কবিতা বঙ্গদেশ বিভাজনের ষড়যন্ত্র থেকে ১৯৯৯ সালের বাংলা ভাষার মাধ্যমে তার আন্তর্জাতিক অভিযাত্রায় ইতিবৃত্ত পরিস্ফুট করে।

অমর একুশের পঞ্চাশ বছর (১৯৫২-২০০২)

২০০২ সালে বাংলাদেশের 'একুশের' সুবর্ণ জয়ন্তী ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে কলকাতাস্থ বাংলাদেশ ডেপুটি হাইকমিশনের পক্ষ থেকে ভাষা-আন্দোলনের শ্রদ্ধা জানাতে প্রকাশ করা হয় 'অমর একুশে' বিশেষ সংকলন। এই স্মারক-সংকলনের বিশেষ তাৎপর্য হলো বাংলাদেশের লেখকদের পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গের বিশিষ্টজনদের রচনার সন্নিবেশ ঘটানো। এই সংকলনে বিশেষ রচনা পর্যায়ে প্রকাশিত হয় বিশিষ্ট

লেখক অন্নদাশংকর রায়ের 'আমি কি ভুলিতে পারি' এবং তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী কান্তি বিশ্বাসের 'বিশ্ব মাতৃভাষা দিবস ও ফেব্রুয়ারির ভাষা-আন্দোনের সুবর্ণ জয়ন্তী'। প্রথম রচনাটি স্মৃতিচারণামূলক এবং দ্বিতীয়টিতে পড়েছে মাতৃভাষা দিবসের তাৎপর্যের কথা। পবিত্র সরকারের 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের ভাবনা', জ্যোতিপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায়ের 'একুশে যা ঘটেছিল, 'একুশে' যা করেছে' এবং রামকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস : কবিতার ভাষা' মূলত একুশে ফেব্রুয়ারির প্রেক্ষাপট, তাৎপর্য এবং প্রভাবের স্বরূপ নির্ধারণ করে। কল্পতরু সেনগুপ্তের 'মাতৃভাষার সংগ্রাম—স্বাধীনতার সংগ্রাম' প্রবন্ধে একুশের সংগ্রাম কিভাবে স্বাধীনতা সংগ্রামে রূপান্তরিত হয়, তারই ইতিবৃত্ত নির্মিত হয়েছে। শুভঙ্কর ঘোষের 'একুশের চেতনা ও আমরা', নৃপেন্দ্র সাহার 'অমর একুশের ছোঁয়া দুলিয়ে দিয়ে যায় 'আমাদেরও', কিংবা সৌমিত্র লাহিড়ীর 'একুশ এলেই কেন মনে পড়ে' শীর্ষক রচনাত্রয়ে ভাষা-আন্দোলনের স্মৃতি, তাৎপর্য এবং পশ্চিমবঙ্গের বাঙালিদের অবস্থান নিয়ে আলোকপাত করা হয়েছে।

কবিতাংশে আছে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের 'পিঠোপিঠি', সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'পায়রাদের ওড়াউড়ি', তারাপদ রায়ের 'কবি ও বাংলাদেশ', সমরেন্দ্র সেনগুপ্তের 'ভাষাদেশ', মঞ্জুষ দাশগুপ্তের 'একুশের চিরঞ্জীবী স্মৃতি', মৃণাল রায়চৌধুরীর 'ভাষা আগুন', 'পঙ্কজ সাহার 'রক্তের আলপানায় আলোর আলপনা' এবং রজত বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'জেগে আছি'। পশ্চিমবঙ্গের বিশিষ্ট-কবিদের কবিতায় ধরা পড়েছে ভাষাপ্রীতি, বাঙালির সংস্কৃতির বন্ধন এবং ভাষা-আন্দোলনের রক্তাক্ত ইতিবৃত্ত ও অনুপ্রেরণায় অন্তহীন বরাভয়ের কথা। সুভাষ মুখোপাধ্যায় যখন লেখেন : 'একুশে যেহেতু/বাঁধা হয় সেতু/ বোঝা যায়, দুই বঙ্গে/ ভাষার সঙ্গে/সম্বন্ধটা/রক্তের', তখন বাঙালি জাতিসত্তার নৃতাত্ত্বিক বন্ধনের সূত্রটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত তাঁর 'ভাষাদেশ' কবিতায় জানান : 'মৃত্যু যখন শেষ/বাংলা ভাষাই তখন আমার একমাত্র দেশ।' এভাবেই কবি মাতৃভাষা ও বাঙালির জন্মভূমিকে অভিন্ন প্রতীকে বাঙ্ময় করেন। ২০০২ সালে কলকাতা থেকে প্রকাশিত 'নাগরিক কথায়' (মার্চ, ২০০২/১০তম বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা) প্রকাশিত হয় ড. প্রথমা রায়মন্ডলের 'একুশের ভাবনা' প্রবন্ধটি। এতে মাতৃভাষার অধিকার ও তার প্রভাব নিয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মুখপত্র 'পশ্চিমবঙ্গ (১ মার্চ, ২০০২) সংখ্যায় 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ক্রোড়পত্র' অংশে প্রকাশিত হয়েছে বুদ্ধদেব বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বাংলা ভাষা : ভালোবাসার দশ দিগন্ত' এবং মন্দিরা ঘোষালের 'ভাষা আন্দোলন ও আমাদের উত্তরাধিকার'। মন্দিরার প্রবন্ধে ভাষার হাত ধরে কিভাবে জাতীয়তা থেকে আন্তর্জাতিকতায় পৌঁছনো যাবে, তার কথাই বলা হয়েছে এইভাবে : 'শব্দের সন্ধানে আমরা ডুব দেব সংস্কৃত, আরবি, ফারসিতে, যাব সমুদ্র পেরিয়ে ফরাসি, জার্মান, ইংরেজীতে বিশ্বের আলো-হাওয়া নিজেদের প্রাণবায়ুতেই মেলা, ধার করা অক্সিজেনে মুমূর্ষুই জীবনযাপন আমাদের লক্ষ্য হবে কি করে? তাই আমাদের মাতৃভাষা নিয়ে পৌঁছে যেতে হবে আলোড়ণের বিন্দু থেকে আন্দোলনের দিকে।' এই অভিযাত্রা নিঃসন্দেহে তাৎপর্যপূর্ণ।

২১শে ফেব্রুয়ারির মহত্তম কাজটি হয় ২০০২ সালে ভাষা-আন্দোলনের সুবর্ণ জয়ন্তীতে। কলকাতার নবজাতক প্রকাশন বের করে 'মহান একুশে' শিরোনামের 'সুবর্ণ জয়ন্তী সংকলন।' গ্রন্থটি সম্পাদনা করেন মজহারুল ইসলাম, চিত্ত মন্ডল এবং প্রথমা

রায়মণ্ডল। সংকলনটিতে বাংলাদেশ পশ্চিমবঙ্গ এবং ত্রিপুরার ২১ শে ফেব্রুয়ারি সংক্রান্ত রচনা বিন্যস্ত হয়েছে। এছাড়া রয়েছে আন্তর্জাতিক ভাষা দিবস সংক্রান্ত একটি পর্যায়। সংকলনের বেশীর ভাগ রচনাই ইতোপূর্বে বিভিন্ন পত্রপত্রিকা, গ্রন্থে এবং সংকলনে মুদ্রিত হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ পর্যায় যেহেতু আমাদের বিবেচনার এক্তিয়ারভুক্ত, সেকারণে সেই দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে এই পর্যায়টিকে সংহত করা হয়েছে। এই প্রবন্ধে ইতোমধ্যে যে-সব রচনার আলোকপাত হয়নি, সেগুলোর একটা রেখাভাস নির্মাণ করা যেতে পারে। এই সংকলনের নেপাল মজুমদার 'অবিভক্ত বঙ্গে মাতৃভাষা ও সাহিত্যে সাম্প্রদায়িকতা-বিরোধী আন্দোলনে মুসলমান বুদ্ধিজীবীসমাজ' নিয়ে আলোকপাত করেছেন। জিয়াদ আলী বর্ণনা করেছে ভাষা আন্দোনের ঐতিহাসিক তাৎপর্য তাঁর 'একুশে ফেব্রুয়ারির ঐতিহাসিকতা' প্রবন্ধে। বাঁধন সেনগুপ্ত 'প্রতিজ্ঞার পতাকা একুশে', অশোক দাশগুপ্তের 'একুশে ফেব্রুয়ারি' মূলত বাঙালি-জাতিসত্তার অনুসন্ধানের কথা বলে। বাংলাদেশের ভাষা আন্দোলনে যাঁরা শহীদ হয়েছিলেন, তাঁদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি তুলে ধরেছেন মজহারুল ইসালম তাঁর 'মহান একুশের অমর শহীদেরা' শীর্ষক রচনায়। 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' পর্যায়ে হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় তাঁর 'একুশের ভাবনা' প্রবন্ধে ভাষা-আন্দোলনের গভীর তাৎপর্য নিয়ে তাঁর নিজস্ব চিন্তাভাবনার কথা ব্যক্ত করেছেন।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় 'আমাদের ভাষা, আমাদের সংস্কৃতি— বাংলাদেশে বাংলা ভাষা ও রবীন্দ্রনাথ' শীর্ষক প্রবন্ধে বাঙালির ভাষা ও সংস্কৃতি প্রসঙ্গে বাংলাদেশে বাংলাভাষা রক্ষার প্রেক্ষিত ও রবীন্দ্র-আন্দোলনের কথা ব্যক্ত করেছেন। দিলীপ মজুমদার তাঁর '২১শে ফেব্রুয়ারি ও বাংলাভাষা' প্রবন্ধে ২১ শে ফেব্রুয়ারির ভাষা-আন্দোলন কীভাবে বাংলাভাষার আন্দোলনকে সংহতি দিয়ে আন্তর্জাতিক করে তুলেছে, সেই বিষয়ে বিশদ বর্ণনা করেছেন।

কবিতাংশে 'শহীদ মিনার' (মুকুলেশ বিশ্বাস), 'একুশের ভাষা' (কেষ্ট চট্টোপাধ্যায়), 'অক্ষর বিষয়ক' (প্রণব চট্টোপাধ্যায়), '২১ শে ফেব্রুয়ারি' (মধু গোস্বামী), 'বাংলা ভাষা আমার ভাষা' (আশিস সান্যাল), 'ঠাঁই দেয়নি মা-কে' (কৃষ্ণা বসু) এবং 'ভাষা : ভালোবাসা' (শ্যামল জানা) ইত্যাদি কবিতার মধ্য দিয়ে ভাষা-আন্দোলনের প্রতি ভালোবাসা, ভাষার অধিকার এবং তার গভীর তাৎপর্য ইত্যাদি বিম্বিত হয়েছে। সমীর দাশগুপ্তের নাটক 'একুশের রোদ্দুর' একুশে ফেব্রুয়ারি সুদূরপ্রসারী গুরুত্ব পরিস্ফুট করেছে। 'মায়ের ভাষার গান' (প্রতুল মুখোপাধ্যায়) এবং 'একুশের গান' (কবীর সুমন)-এর মধ্য দিয়ে বাংলার ভাষাপ্রীতি ও একুশে ফেব্রুয়ারির তাৎপর্য উদ্ভাসিত হয়েছে। এই ঐতিহাসিক সংকলনটির ইতোমধ্যেই তিনটি সংস্কারণ প্রকাশিত হয়েছে।